# হোরোর সিনেমার রাত বারোটা ও রাজনীতিতে ত্রাস থেরাপী

আহসান মোহাম্মদ

হোরোর সিনেমা বা ভয়ের ছবিগুলোর কাহিনীতে বৈচিত্র থাকলেও এ ধরণের সিনেমাগুলোর কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট থাকে। সিনেমাগুলো সাধারণতঃ শুরু হয় খুব শান্ত, স্নিগ্ধ ও সুন্দর পরিবেশে। হয়তো দেখা যায় পাহাড়ের পাদদেশে ছবির মত ছোট্ট একটি গ্রামে শিশুরা খেলা করছে ও সুন্দর তরুণ-তরুণীরা শান্ত লেকের ধারে হাত ধরাধরি করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এরপর সন্ধ্যা নেমে আসলে একটা গা ছমছমে ভাব শুরু হয়। দূরে কোথাও শেয়ালের ডাক শোনা যায়। তারপর ঘড়ির কাঁটা রাত বারোটার ঘর ছোঁয়ার সাথে সাথে সব কিছু বদলে যায়। পরীর মত সুন্দর মেয়েটির মুক্তোর মালার মত দাঁতের পাটির দুপাশ থেকে দুটো দাঁত বড় ও সুচালো হয়ে যেতে থাকে, তার নীল চোখের রং পাল্টে রক্তের চেয়েও লাল বর্ণ ধারণ করে এবং তার চম্পাকলির মত আঙ্গুল থেকে হিংস্র শ্বাপদের নখর বের হয়ে পড়ে। আশে পাশের সকল চেনা জানা মানুষদের মুখ পাল্টে বীভৎস চেহারা বেরিয়ে আসতে থাকে। তখন বোঝা যায় যে দিনের আলোয় মানুষের বেশে যারা হেসে খেলে বেড়াচ্ছিল তারা কেউ মানুষ নয়। এমনকি মাটি ফুড়ে ও চিরচেনা ঘর-বাড়ির দেয়াল ভেদ করে ভয়ংকর ভৌতিক প্রাণীরা কিলবিল করে বেরিয়ে আসতে থাকে। সাম্প্রতিক ঘটনাবলিতে মনে হচ্ছে, রোজার সংযমের শান্ত সময় পেরিয়ে ড. ইউনূসের নোবেল বিজয় ও ঈদের সম্মিলিত আনন্দের মাঝে হঠাৎ করে বাংলাদেশের জন্য ঘড়ির কাটা রাত বারোটার ঘর ছুয়েছে।

দুই বৃহৎ দলের মহাসচিবদের আশার বাণী এবং উষ্ণ করমর্দনের দৃশ্য দেখে দেখে অনেকের মত মনে হয়েছিল ঈদের আগে যখন তাঁরা আবার বসবেন, তাঁদের নেত্রীদ্বয় যথাক্রমে ওমারাহ ও কানের চিকিৎসা শেষে দেশে ফিরবেন ও জনগণের কথা ভালো করে শুনতে পারবেন, তখন নিশ্চয় তাঁরা একটা সমাধানে পৌঁছতে পারবেন। একত্রিশ দফার কোন না কোনটিতে গিয়ে দুজন একমত হতে পারবেন। একমত না হতে পারলেও ভোটারদেরকে বিপাকে পড়তে হয় এমন কোন কিছু তারা করবেন না, এ বিশ্বাস নিয়ে দেশের বাড়ীতে গিয়েছিলাম আব্বা-মায়ের সাথে ঈদ করতে।

ঈদের আগের রাতে জানা গেল সংলাপ ভেঙ্গে গেছে। তাহলে এতোদিন তাঁরা যে ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে দরজা বন্ধ করে আলোচনা করেছেন এবং আলোচনা শেষে দুজন-দুজনের হাত ধরে দেশবাসীকে জানিয়েছেন যে সংলাপ সফল হচ্ছে তার অর্থ কি ছিল? তাহলে কি তাঁরা হোরোর সিনেমার রাত বারোটার জন্য অপেক্ষা করছিলেন? বিরোধী দল প্রকাশ্যে বলে আসছিল, তাদের দাবী মানা না হলে তারা লাঠি-সোটা (কৌতুক করে বলা হয়েছিল লাঠি-বৈঠা) নিয়ে সারা দেশ অচল করে দেবে। এভাবে পেশীশক্তি ও অস্ত্র দিয়ে দেশ অচল করে দেয়ার হুমকী বাংলাদেশের তো বটেই গণতান্ত্রিক বিশ্বের ইতিহাসে পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ। ঈদের আগের দিন টিভি চ্যানেলগুলো দেখালো দলটির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে লাঠি সোটা জড়ো করা হচ্ছে। যেসব টিভি চ্যানেলগুলোকে দলটির নেত্রী নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন সেগুলোকেও লাঠি-বৈঠার ছবি তুলতে অনুমতি দেয়া হলো। চট্রগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের বিরোধী দলীয় মেয়র অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্দর বন্ধ ঘোষণা করলেন। যে সকল নেতারা এতোদিন

যুক্তি দিয়ে তাদের দাবীর কথা বলছিলেন, তাদের বক্তব্য পাল্টে গেল। পাল্টে গেল তাদের চেহারাও। তাঁরা সরাসরি রাষ্ট্রের আইন অমান্য করার ঘোষণা দিলেন।

পরিস্থিতি খারাপ হচ্ছে দেখে ঈদের পরদিনই চলে আসতে চাচ্ছিলাম। অবুঝ মা চাচ্ছিলেন তাঁর আদরের ছেলেটা যতটা বেশী মুহূর্ত সম্ভব তাঁর কাছে থাক। তাছাড়া ঈদের সময় বাসে হঠাৎ করে টিকেট পাওয়াও সম্ভব নয়। এদিকে স্ত্রীর ধারণা কার কিংবা মাইক্রোবাসে হাইওয়েতে বেরুলেই সপরিবারের সকলে দুর্ঘটনায় মারা পড়বো। ফলে পূর্বনির্ধারিত সময়ে ঈদের পরের শুক্রবার রওনা দিয়ে গাবতলীতে বাস যখন পৌঁছল তখন রাত হয়ে গেছে। অন্য বার দীর্ঘ ক্লান্তিকর ভ্রমণের পর গাবতলীর দৃশ্য মরুভূমিতে মরুদ্যান বা অসীম সমূদ্রে দ্বীপের মত মনে হয়। কিন্তু এবারের চিত্র একটু অন্যরকম মনে হলো। চারিদিকে থমথমে পরিবেশ। সিএনজি স্কুটার, ট্যাক্সি ক্যাব কিছু নেই। কয়েকটা রিক্সা পেলাম। কিন্তু ধানমন্ডী শুনে তারা ভয়ে আসলো না। শেষে বৃদ্ধ মা, দুটি শিশু আর অতিমাত্রায় ভীত স্ত্রীকে নিয়ে পায়ে হেটে বাসার উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। যে বৃদ্ধ মা এক ঘর থেকে আরেক ঘরে যেতে হাপিয়ে ওঠেন, তাকে মাইলের পর মাইল হাটাতে হলো। যে শিশু দুটি রাতে ঘুমালে আমরা স্বামী-স্ত্রী অনেকবার তাদের ঘরে গিয়ে দেখে আসি ফ্যানের স্পীড ঠিক অছে কিনা যাতে ঠান্ডা বা গরম না লাগে, কিংবা মশারির সাথে হাত লেগে গেছে কিনা যাতে বাইরে থেকে মশা না কমাড়াতে না পারে, তাদেরকে অত্যন্ত ঝুকিপূর্ণ একটি পরিবেশে দীর্ঘপথ হাটিয়ে বাসায় নিয়ে আসতে হচ্ছে। জীবনে এ ধরণের অবস্থায় পড়িনি কখনো। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় বয়স ছিল কয়েক মাস। আমাকে কোলে নিয়ে মা-বাবা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা শহর ছেড়ে গভীর গ্রামে আশ্রয় নিয়েছিল। স্বাধীন দেশে নিজেদের অতি আপনার নেত্রীদের জন্য আবারও সেই রকম হাটতে হলো। দোয়া দরুদ পড়তে পড়তে গাবতলী থেকে ধানমন্ডী পর্যন্ত হেটে হেটে যখন বাসায় পৌঁছলাম, তখন অনেক রাত হয়ে গেছে। টিভি ছেড়ে দেখলাম যারা চট্রগ্রাম-সিলেট রুটের যাত্রীদের যন্ত্রণা আরও দুর্বিসহ।

পরদিন বোঝা গেল এ হোরোর সিনেমার আসল দৃশ্যগুলো শুক্রবারে শুরুই হয় নি। টিভি ক্যামেরায় যা দেখা গেল তাতে নিজের চোখকেই বিশ্বাস হচ্ছিল না। প্রকাশ্য দিবালোকে লাঠি সোটা নিয়ে মিছিল করেছ রাজনৈতিক কর্মীরা। বৃষ্টির মত ইট-পাটকেল ছোড়া হচ্ছে। স্থানে স্থানে আগুন জ্বলছে। রাস্তায় রক্তের ছোপ লেগে আছে। তার মধ্যে একটি দৃশ্যে দেখে মাথা ঝিমঝিম করে উঠলো। এক তরুণকে ধরেছে লাঠি-বৈঠাধারী কয়েক যুবক। সে হয়তো পালাতে যাচ্ছিল। এক টানে তার পাঞ্জাবী ছিড়ে দুভাগ হয়ে গেল। বৈঠা দিয়ে তাকে সকলে পেটানো শুরু করলে সে মাটিতে পড়ে গেল। দশ বারোজন মিলে তাকে ঘিরে ধরে অব্যাহতভাবে পিটিয়ে চলেছে। কেউ একজন দেহের সর্বশক্তি দিয়ে তাকে মাথায় আঘাত করলো এবং নীচু হয়ে তাকে দেখলো। আরো কয়েকজন কাছে গিয়ে নীচু হয়ে দেখে সম্ভবতঃ নিশ্চিত হলো যে সে মারা গেছে। তখনও হয়তো অনেকের জিঘাংসা মেটেনি। দেখা গেল তারা মৃত তরুনটির মরদেহের উপর বৈঠা দিয়ে আঘাত করছে। দেখা গেল কেউ কেউ তার মৃতদেহের উপর দিয়ে হেটে গেলো। এ ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে কয়েকটি টিভি চ্যানেলের সাংবাদিকের গলা ভারী হয়ে এলো। তাঁরা বললেন, মানুষ সাপকেও এভাবে পিটিয়ে মারে না। তারপর মিশন শেষে তাদের নেতাদের মত কর মর্দন করলো। টিভি চ্যানেলগুলোতে লক্ষ লক্ষ দর্শকের মত দেখলাম। দেখে স্ত্রীর মাথা ঘুরতে লাগলো। সে জোরো জোরে কেঁদে ফেললো। তার কান্না শুনে শুনে মা বললেন, কি হচ্ছে রে? টিভি অফ করে স্ত্রীকে বাথরুমে নিয়ে গেলাম। মাকে আমরা টিভির আসে পাশে আসতে দিই নি।

একই ধরণের জিঘাংসা ও সন্ত্রাস ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে সারা দেশে। রাজনৈতিক নেতা-কর্মীরা প্রতিপক্ষকে হত্যা করছে, তাদের বাড়িতে হামলা করছে, তাদের ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে আগুন ধরাচ্ছে। ইতোমধ্যে প্রতিপক্ষের হাত কেটে নেয়ার মত বীভৎস ঘটনাও ঘটেছে। কোন কোন দল টিভি ভবন ও অন্যান্য সরকারী স্থাপনা উড়িয়ে দেয়ার হুমকী দিয়েছে।

বাংলাদেশের জন্য এ ধরণের হোরোর ছবি এই প্রথম নয়। চেনা মুখ এখানে বার বার অচেনা হয়ে যায়। বিশেষ বিশেষ সময়ে মুখোশগুলো খুলে পড়ে। জনগণ প্রথমে থমকে যায়, কিন্তু তারপর ঘুরে দাড়ায়। বছর দুয়েক আগে হঠাৎ করেই কারো কারো নুরানী চেহারার মুখোশ খুলে বেরিয়ে পড়েছিল জঙ্গী জল্লাদের রূপ। তখন মনে হয়েছিল তারা অপ্রতিরোধ্য। তাদের কাছে আত্ম-সমর্পণ ছাড়া আর কোন গতি নেই। কিন্তু জনগণ যখন ঘুরে দাড়ালো তখন তাদেরকে শিকড় সহ উপড়ে ফেলতে বাংলাদেশের খুব বেশী সময় লাগে নি।

তবে ত্রাস সৃষ্টি করে ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা কাকতালীয় কিংবা আকস্মিক নয়, বরং রাজনৈতিক দলগুলো অনেক পরিকল্পনা করেই এ ধরেণের পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। এর পিছনে দুটি কারণ রয়েছে, প্রথমতঃ তাদের মাথায় ঢুকে গেছে যে শান্ত পরিবেশে নির্বাচন হলে জনগণ তাদেরকে হয়তো ভোট দিবে না, তাই তারা বিজয়ের আগে বিজয় চায়। যে কারণে পেশী শক্তি দিয়ে দেশ দখল করার কথা প্রকাশ্যে বলতে তাদের বাধে নি। তবে তার থেকে বড় কারণ হচ্ছে, তারা ভোটারদেরকে স্থির মস্তিস্কে চিন্তা করার সুযোগ দিতে চায় না। তারা চায় না জনগণ দলীয় পরিচয়ের উর্দ্ধে উঠে ঠান্ডা মাথায় সৎ ও যোগ্য প্রার্থী খুজুক। কেননা তাহলেই তো তাদের থলের বিড়াল বের হয়ে যাবে। জনগণ নেতাদের যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন করা শুরু করবে। তাছাড়া দীর্ঘদিন ধরে আমাদের রাজনীতিকরা, স্বার্থান্ধ কিছু সম্মানিত নাগরিক এবং দলান্ধ বুদ্ধিজীবিরা এ ধরণের অরাজকতা সৃষ্টির জন্য মানসিকভাবে রাজনৈতিক কর্মীদেরকে তৈরী করেছেন। কিছুদিন আগে বিবিসির বাংলাদেশ সংলাপ অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হচ্ছিল চ্যানেল আইতে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন ড. কামাল হোসেন এবং আওয়ামী লীগ নেত্রী, নারী নেত্রী ও শ্রমিক নেত্রী শিরিন আকতার। উপস্থিত দর্শকরা প্রশ্ন করলেন যে বিদ্যুতের দাবীতে আন্দেলন করতে গিয়ে নিরীহ জনগণের গাড়ী ও অন্যান্য সম্পদ ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ এবং রাষ্ট্রীয় সম্পদ যেমন বিদ্যুৎ সঞ্চালন কেন্দ্রে হামলা কতটুকু আইন, গণতন্ত্র ও সংবিধান সম্মত। তাঁরা দুজনই এসকল অরাজকতার সমর্থন করে বলেছিলেন, জনগণ যখন শান্তিপূর্ণ উপায়ে তাদের অধিকার না পায় তখন তারা কি করবে! যখন সংবিধানের ব্যাখার জন্য আমাদের অধিকাংশ মিডিয়া যাদের কাছে যাচ্ছে, তখন তাকে পরিহাস বলে মনে হয়। শেষ বয়সে এসে একবার মন্ত্রী হবার জন্য অনেকেই অনেক কিছু করছেন। কিন্তু আইনকে নিজের হাতে তুলে নেয়া, পেশী শক্তিকে নীচে সকল নিয়ম নীতি পদদলিত করার রেওয়াজ জাতির জন্য ভালো কিছু বয়ে আনবে না।

এ লেখা যখন প্রকাশিত হবে, তখন পরিস্থিতি হয়তো শান্ত হয়ে যাবে। হোরোর ছবির ভীতিকর চরিত্রগুলো আবার মুখোশের আড়ালে নিজেদেরকে লুকিয়ে ফেলবে। তাদের ভয় দেখানোতে হয়তো কিছুটা কাজও হবে। তবে সে ভয় দীর্ঘ দিন মানুষের স্মৃতিতে থাকবে এবং নীরবে তারা ত্রাসের বিরুদ্ধে দাড়িয়ে যাবে। একাত্তরে পাকিস্তানীরা ভয় দেখিয়েছিল, স্বাধীনতার পরবর্তীতেও ভয় দেখানো হয়েছিল। সে সকল ভয় দেখানোতে যে কাজ হয়নি তা জানতে ইতিহাস পড়তে হয় না। ত্রাসের মাধ্যমে ক্ষমতায় যাবার কৌশল যে কাজ করবে না, বরং উল্টো তাদের বিরুদ্ধে জনগণের নীরব প্রতিবাদকে সংগঠিত করবে তা আমাদের রাজনীতিকরা কবে বুঝবেন জানি না।